সংবাদ

তারিখ 31 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা আইন ২০১৩ ও শিক্ষকদের অবস্থান

এ এন রাশেদা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ০৫.০৮.২০১৩ তারিখে অন লাইনে শিক্ষা আইন ২০১৩ প্রচার করেছে এবং ২৫ আগস্টের মধ্যে মতামত চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে চাই।

শিক্ষা আইন ২০১৩-এর 'প্রস্তাবনা'য় যা বলা হয়েছে তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ১৭ নম্বর ধারার আলোকে এবং 'গ' এর নির্দেশে। যেমন 'গ'-তে আছে 'আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।' তাই মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তার পরও বলতে হবে ওই ধারার 'ক'-এর আলোকে প্রস্তাবনায় প্রথমেই বলা হয়েছে 'যেহেতু একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে।' এখানে 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা'র লক্ষ্য নির্ধারিত হলেও কিন্তু শিক্ষানীতি ও শিক্ষা আইনে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। কারণ পরক্ষণেই বলা হয়েছে 'প্রাথমিক শিক্ষা' বলিতে সাধারণ শিক্ষার এবং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বুঝাইবে।' আবার প্রাক-প্রাথমিক সম্পর্কে বলা হয়েছে 'সব শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়/এবতেদায়ি মাদ্রাসায় প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু করা হবে।' আমরা জানি, এছাড়াও আছে ইংরেজি মাধ্যম। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষণ এবং রাজনৈতিক কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল- সেখানেই তো আমাদের সেই বৈষম্য ও সেই শোষণব্যবস্থা রয়েই গেছে। আর শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বৈষম্যের কারণেই একদিকে তৈরি হচ্ছে হেফাজতে ইসলাম আরেক দিকে ইংলিশ মিডিয়াম ও বাংলা মিডিয়াম। এই দুই ধারার চেহারা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করছে। তাই এই নানা ধারার শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র জাতিকে এক সুতায় গাঁথতে পারছে না। পারছে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ গড়তে।

এই 'শিক্ষা আইন' শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্বজনীনভাবে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা ভালো মানের শিক্ষা পেতে পারে। খুবই ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এখানে এই আইনে ঘাটতি আছে যা শিক্ষানীতির লক্ষ্য অর্জনে কখনোই সম্ভব হবে না- জীবনভর একই আবর্তে ঘুরপাক খাবে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বিষয়বস্তুই হচ্ছে শিক্ষক। সেই শিক্ষক নির্বাচনেই দুর্বলতা। শিক্ষা আইনে 'মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন' প্রসঙ্গে প্রথম থেকে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য সর্বনিম্ন যোগ্যতা ধরা হয়েছে যথাক্রমে সব স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ অথবা দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাস এবং সব স্তরে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫ অথবা দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণীসহ স্নাতক অথবা সমমানের পরীক্ষায় পাস। সে কারণেই প্রশ্ন বর্তমান ডিজিটাল এই যুগে সেই মানের শিক্ষার্থী তৈরির জন্য অ্যানালগ শিক্ষক দ্বারা কীভাবে সম্ভবপর হবে? শিক্ষকদের বেতন স্কেল সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্যই যে এই চাহিদার কথা বলা হচ্ছে- তা বোধগম্য। অথচ শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও চাহিদা হচ্ছে শিক্ষককে হতে হবে সৃজনশীল, হতে হবে মেধাবী তা না হলে সৃজনশীল মেধাবী, তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম কীভাবে গড়ে উঠবে? অথচ একজন প্রশাসন ক্যাডারের যে বেতন স্কেল, যে সুযোগ-সুবিধা তার সমপরিমাণ অংশ শিক্ষা ক্যাডারে দিলে জিপিএ ৫ প্রাপ্তরাই তো শিক্ষকতা পেশাকে সম্মানজনক ভেবে চলে আসবে। ২.৫ প্রাপ্তরা অন্য পেশায় যেত। এতে শিক্ষকতা পেশার যেমন মান বাড়ত তেমনি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটত এবং এতইভাবে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতো।' তাই এটা পরিষ্কার যে, শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন চিন্তা না করে আইন দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সমগ্র দেশবাসীর উন্নয়ন সম্ভবপর নয়।

গত ২২ আগস্ট একুশে টিভি চ্যানেলে মাননীয় উপদেষ্টার মাঠ পর্যায়ের বৈঠকে শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনে জানা গেল সেখানে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় বেঞ্চের অভাবে ক্লাস বন্ধ থাকে। সভাপতি বললেন, সরকারের ভরসায় না থেকে এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের থেকেও তো নেয়া যেতে পারে। খুবই ভালো প্রস্তাব। তবে এ ধরনের নানা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য চাই শিক্ষকের মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও দূরদর্শিতা। এসব কিছুর মূল মেধা। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় মেধাবী ও উদ্যমী ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ ধরনের মেধাবী ও উদ্যমী শিক্ষকরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নানা কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি পরিচালনা করতে পারে। তা দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ থেকে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানমেলা, বন্যায় ত্রাণকাজ, ঘূর্ণিঝড় এলাকায় কাজ, সম্ভব হলে এমনকি প্রতিষ্ঠানে বাগান তৈরির মতো কাজেও প্রয়োজনবোধে নেতৃত্ব দিতে পারে। তাহলেই সমাজের সবক্ষেত্রেই মেধাবীদের জোগান দেয়া সম্ভবপর হবে। আর তা না হলে বর্তমানে ২.৫ জিপিএ প্রাপ্তদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ দিলে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের কাহিনী দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতেই থাকবে। কারণ পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তরের দশকের দ্বিতীয় বিভাগের কৃতকার্যদের সঙ্গে বর্তমানের দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্তরা কিছুতেই সমার্থক হতে পারে না। কারণ এখনকার মতো নম্বর প্রাপ্তির সুযোগ-সুবিধা তখন ছিল না। তাই বর্তমানে শিক্ষক নির্বাচনের জন্য ব্রিটিশ আমলের মানদণ্ড এক হতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ মূল্যমানে নিতে চাইলে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরও সর্বোচ্চ মানের হতে হবে। এবং তার জন্য সর্বোচ্চ আর্থিক মূল্যও দিতে হবে- সেই আইনই তো দরকার।

আবার বিজ্ঞান শিক্ষা ধারায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে। এর অন্যতম একটি কারণ বিজ্ঞান শিক্ষকের স্বল্পতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। এক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে বিজ্ঞানী শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের এক্সট্রা অ্যালাউন্সের ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের এক্সট্রা বৃত্তির ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টির জন্য আইন বা অনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন- যা নীতিতে উল্লেখ নেই।

০৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালিত হয়- ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে যে সময়ের মহাপরিচালকের প্রস্তাব অনুসারে। কারণ ১৯৬৬ সালের ০৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোর বা প্রতিনিধিদের সম্মেলনে ১৪৫টি সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে আইএলও তা অনুমোদন করেছিল এখানে দু-একটি সুপারিশের উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করছি। যেমন শিক্ষকদের সমাজে গুরুত্ব ও সম্মান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'সামগ্রিক জনস্বার্থে যেহেতু শিক্ষা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকার করতে হবে।' শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'শিক্ষকদের বেতন এমন হতে হবে যাতে সমাজে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব ও মর্যাদা, শিক্ষকতা পেশায় কোন ব্যক্তির যোগদান, তার ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিফলিত হয়।' আর প্রতিনিধিত্ব কর্মকাণ্ড বা যাকে রাজনীতি বলা যেতে পারে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ব্যক্তির বিকাশ ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণে শিক্ষকদের উৎসাহিত করতে হবে।' এবং আরও বলেছে যে, যতদিন তারা সেই কাজে থাকবে ততদিন তার চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

শিক্ষানীতি ২০১০ ও শিক্ষা আইন-২০১৩তে কি ইউনেস্কোর সুপারিশমালার কোন প্রতিফলন আছে? উত্তরে বলা যায়- একেবারেই নেই। তাই বলা যেতে পারে শিক্ষা আইন পরিণত হবে 'সার্টিন জনকা গেরের মতোই।'